আমার কার্টুন-কথা

ঋতুপর্ণ বসু। এই সময়ের শক্তিশালী একজন কার্টুনকার। পেশায় শিক্ষক। নবীন কার্টুন-শিল্পী হিসাবে এই প্রথম কলম ধরলেন উদ্ভাসের জন্য। কার্টুনিস্ট হয়ে ওঠার গল্প তাঁর কলমে।

খুব ছেলেবেলা থেকেই যে জিনিসটা সবচেয়ে ভাল পারতাম তা হল ছবি আঁকা। বেশ মনে আছে চক হাতে নিয়ে বাড়ির মেঝেগুলি হামাগুড়ি দিয়ে নানান আঁকিবুকিতে ভরিয়ে তুলছি। আমার উৎসাহ দেখে মেঝেতে এক-একটি অবয়ব এঁকে দিতেন আমার বাবা। সেই অবয়বগুলি রপ্ত করে ফেলতে আমার বেশি সময় লাগত না। এরপর চলল বড়দের মতো কলম বাগিয়ে খাতার উপর অপটু হাতে শিল্পচর্চা। অনেক সময় দরকারী কাগজ বা অফিসের কাগজেও ফুটে উঠত এই 'শিল্পচর্চা'র নিদর্শন। ছবি আঁকতে আঁকতে আমার অনেক সময় কেটে যেত। স্কুলের পাঠ্যবইয়ের পাতায় পাতায় – নোটবইয়ের এখানে সেখানে অগোছালোভাবে কত যে ড্রয়িং করেছি তার হিসাব নেই। তবে নিজের এই ভগবানদত্ত গুণটির প্রতি যতটা সিরিয়াস হওয়া উচিত ছিল ও চর্চার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা উচিৎ ছিল তার কোনোটাই হয়নি।

এরপর স্কুল পাশ করে কলেজ, কলেজের গণ্ডি পার করে বিশ্ববিদ্যালয় – বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্ব শেষ হতে না হতেই শিক্ষকতার চাকরিতে প্রবেশ। এই দীর্ঘ ছাত্রজীবনে না করতে পেরেছি নিজের সহজাত শিল্পীসত্ত্বার প্রতি কোনো সুবিচার – না হয়েছে শিল্পী বা শিল্প জগতের সঙ্গে কোনো সংস্রব। এমনকি আর্ট কলেজে ঢোকার কথাও মনে হয়নি কখনও। সদ্য চাকরিতে ঢুকে জীবনযাপনের অনিশ্চয়তা যখন অনেকটা কেটে গেছে – তখন নিজের ভাললাগার ব্যাপারগুলো নিয়ে চর্চা করার একটা আগ্রহ তৈরি হয়।

শুরু করলাম বই কেনা – বিশেষতঃ কমিক্স ও চিত্রশিল্প সম্পর্কিত। যাতায়াত শুরু হল বিভিন্ন চিত্র-প্রদর্শনীতে। বই ও পত্রপত্রিকায় ইলাস্ট্রেশন দেখা, কমিক্স নিয়ে নিজের কৌতুহল মেটানো ও কার্টুন নিয়ে চর্চা করাটা মূলতঃ ওই সময় থেকেই আরম্ভ। এই প্রক্রিয়াগুলি এমনই যে একবার শুরু হলে আর থামার ব্যাপার নেই। তাই এই বিষয়গুলি আজও সমানভাবে আমার মনের খোরাক জুগিয়ে চলেছে। বই আমি খুবই ভালবাসি এবং

বিশেষতঃ কার্টুনের ওপর বই সংগ্রহ করাটা আমার নেশা। তবে বই জমতে জমতে এখন স্থান সংকুলানের সমস্যা বেশ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

আমার বাবা আমাকে বলেছিলেন 'তুই নিয়মিতভাবে ভালো ভালো এইসব একজিবিশন, সেমিনার বা ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করবি। তাতে সমমানসিকতাসম্পন্ন লোকজনদের সাথে তোর যোগাযোগ গড়ে উঠবে – একটা ভাল সার্কেলের মধ্যে তুই চলে যেতে পারবি।' বাবার কথাটা বেশ তাড়াতাড়িই ফলে গেল কারণ সিগাল আর্টস এন্ড মিডিয়া রিসোর্স সেন্টারে 'রে সোসাইটি' আয়োজিত একটি সেমিনারে আলাপ হয়ে গেল বিশ্বদেব গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে। নামটির সঙ্গে পরিচিতি আগেই ছিল

কারণ বিশ্বদেববাবুর সহ-সম্পাদনায় বেরোতে শুরু করেছে একের পর এক দুরন্ত কাজ *রঙ্গ ব্যঙ্গ রসিকেষু* পত্রিকার ব্যানারে। *কাফী খাঁ, রেবতীভূষণ, অহিভূষণ মালিক, শৈল চক্রবর্তী* ইত্যাদি সংখ্যা আমাদের দেশে কার্টুন ডকুমেন্টেশনের ক্ষেত্রে এক একটা মাইলফলক। কার্টুনপ্রেমী ও সংগ্রাহক বিশ্বদেববাবু অচিরেই হয়ে উঠলেন আমার অগ্রজপ্রতিম। ওনাকে একসময় জানালাম আমার কার্টুন আঁকার ইচ্ছের কথাটা। উনি সানন্দে *রঙ্গ ব্যঙ্গ রসিকেষু* পত্রিকায় কার্টুন আঁকার জন্য প্রস্তাব দিলেন। ২০০৩ সালে উক্ত পত্রিকায় আমার প্রথম কার্টুন ছাপা হয়। এক বিশাল মুখব্যাদানকারী সিংহের পেটে চলে যাচ্ছে অসংখ্য লিলিপুট আকারের শিক্ষিত যুবক। কার্টুনটির বিষয় ছিল 'বেকারত্ব'। প্রথম কার্টুনটি ছাপা হবার পর দ্বিগুণ উৎসাহে শুরু করলাম *রঙ্গ ব্যঙ্গ রসিকেষু* পত্রিকায় ইলাস্ট্রেশন ও প্রচ্ছদ। এই সূত্রে আবার শুরু হয়ে গেল ছবি আঁকা প্র্যাক্টিস করা – তবে এবার একটু সিরিয়াসভাবে। ভাল মানের তুলি, রং, নিব ও কালি কিনে ড্রয়িং অভ্যাস, ব্রাশ টানা, ক্রোকুইলের ব্যবহার – এই সমস্ত ব্যাপার নিয়ে উঠে পড়ে লাগলাম। স্বশিক্ষার মাধ্যমে চিত্রবিদ্যা আয়ত্ত্ব করার এই প্রক্রিয়া যেন ছিল মহাভারতের একলব্যের একক প্রয়াসের মত। যে কোন সাধনাই গুরু ছাড়া অসম্পূর্ণ থাকে। আমার ক্ষেত্রে দ্রোণাচার্যের জায়গাটি নিয়েছিলেন স্বনামধন্য শিল্পী দেবাশীষ দেব। তখনও পর্যন্ত কোনো ব্যক্তিগত যোগাযোগ গড়ে ওঠেনি তার সঙ্গে। কলেজে পড়ার সময় থেকেই দেবাশীষ দেবের ছবি খুব আকর্ষণ করত। পরে যখন নতুন করে ফিরে এল ছবি আঁকার অভ্যাস তখন বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, সংবাদপত্র বা বইতে প্রকাশিত দেবাশীষ দেবের আঁকা ছবিগুলি আমাকে পথ দেখিয়েছিল। শেখার তাগিদে আমি ওনার ছবিগুলিকে একধার থেকে নকল করতে আরম্ভ করেছিলাম। ওর আঁকাগুলি আমার কাছে যেন Training

Manual এর অংশ। দেবাশীষ দেবের ড্রয়িং, কম্পোজিশন, রং চাপানো, লেটারিং সব কিছু খুব মন দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে গেছি বারবার। এখনও করি। দেবাশীষ দেবের সাথে আলাপ করি জীবনানন্দ সভাগৃহে 'শিশুসাহিত্যে অলঙ্করণ' বিষয়ক একটি সেমিনারে। দেবাশীষ দেব অত্যন্ত মিশুকে ও বন্ধুবৎসল – কারণ এক লহমায় আমার মত গোটানো স্বভাবের মানুষকে বেশ আপন করে নিলেন। তাঁর সান্নিধ্য আমার ছবি আঁকার কাজে আরও গতি এনে দিল। একটু অনিয়মিতভাবে হলেও ওঁর বাড়িতে যাতায়াত শুরু হল। গোড়ায় ওঁকে সম্বোধন করতাম দেবাশীষবাবু বলে পরে সেটা দেবাশীষদা হয়ে গেল। আমার আঁকা ওনাকে দেখাতাম – উনি ভুলত্রুটিগুলি সংশোধন করে দিতেন – প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতেন। ওঁর কাজ দেখে ও কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি।

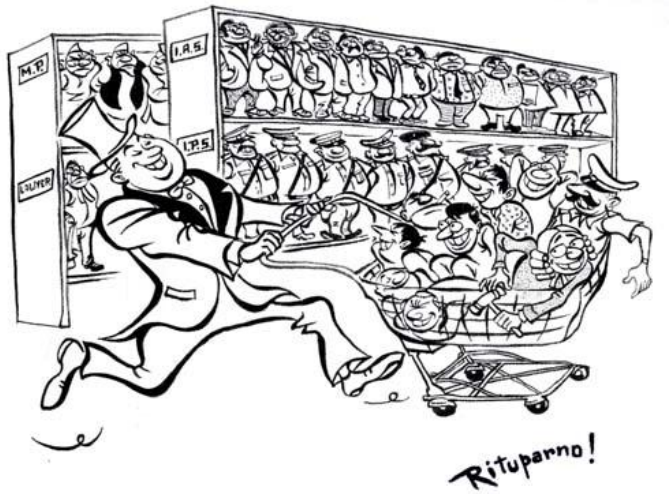

২০০৭ সালে কলকাতা বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গণের বাইরের মাঠে। বাঙালির অত সাধের বইমেলা তখন ঠাঁইনাড়া হয়ে স্থায়ী ঠিকানা খুঁজে বেড়াচ্ছে। মিলনমেলায় তখনও সে থিতু হয়নি। মনে আছে সেই ২০০৭-এর বইমেলায় বেশ কিছু স্টলে গিয়ে প্রকাশক ও লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদকদের সাথে যোগাযোগ করে নিজের পোর্টফোলিও দেখাই। তেমন কোন সাড়া পাইনি। ব্যতিক্রম কেবলমাত্র *এখন বিসংবাদ* নামে একটি পত্রিকার স্টল। আমি আগেই দেখেছিলাম ওনারা পত্রিকার বেশিরভাগ প্রচ্ছদেই একটা বড় কার্টুন ছাপান। আমি সরাসরি অ্যাপ্রোচ করি ওঁদের কাছে। সম্পাদক বাসুদেব ঘটক শুধু কার্টুন ভালবাসেন তাই নয় – শিল্পমাধ্যম হিসাবে কার্টুনের প্রচার ও প্রসারে তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ। সেই যে *এখন বিসংবাদ* পত্রিকার সাথে যোগাযোগ শুরু হল তা দিনে দিনে আরও গভীর হয়েছে। ২০০৭ থেকে ২০১৬ – নয় নয় করে অনেক প্রচ্ছদই আঁকার সুযোগ পেয়েছি। *এখন বিসংবাদ* পত্রিকাকে কৃতিত্ব দিতে হবে আমার কার্টুনচর্চার ধারাবাহিকতাকে অব্যাহত রাখার জন্য।

এই ২০০৭ সালের বইমেলাতেই আত্মপ্রকাশ করে *বিষয় কার্টুন* পত্রিকা। যাকে বলা যায় চলতি সময়ের কার্টুন বিষয়ক একমাত্র পত্রিকা। বিশ্বদেব গঙ্গোপাধ্যায়ের সুযোগ্য সম্পাদনায় প্রকাশিত পত্রিকাটি আজ মানুষের কাছে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। পথচলা শুরু হয়েছিল কার্টুনিস্ট কুট্টিকে নিয়ে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। তারপর একে একে যতীন সেন, হার্জ, রেবতীভূষণ, সমর দে, ময়ূখ চৌধুরী, খালেদ চৌধুরী ও প্রতুল মুখোপাধ্যায়

সংখ্যা বের হয়েছে। এই পত্রিকার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকতে পেরে খুব ভাল লাগে।

২০১২ সালে যে ঘটনাটি ঘটে তা আমার কাছে বেশ অভূতপূর্ব। প্রকাশক সুমন্ত বিশ্বাসের 'ঠিক ঠিকানা'-র প্রথম বই *পরিবর্তন* আদতে কার্টুনেরই বই। বইটি আদ্যোপান্ত রাজনৈতিক এবং এর সব কার্টুনই আমার আঁকা। প্রকাশিত হয়েছিল 'আরবি' ছদ্মনামে। সাবেক বাম আমল ও নবাগত পরিবর্তিত সরকারের কর্মকাণ্ডের তুলনা করা হয়েছে কার্টুনের মাধ্যমে। এর সুন্দর ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন অধ্যাপক শুভেন্দু দাশগুপ্ত।

শুভেন্দুদার কথা একটু বিশদে আলোচনা না করলেই নয়। অর্থনীতির প্রাক্তন অধ্যাপক এই সুভদ্র মানুষটির ভালবাসার বিষয় তথা গবেষণার বিষয় হল কার্টুন। কার্টুন সংগ্রাহক থেকে এঁর উত্তরণ ঘটেছে কার্টুন-সংগঠকের ভূমিকায়। ২০১৩ সালে শুভেন্দুদার উদ্যোগে কলকাতার নামী, অনামী সিনিয়র ও জুনিয়র কার্টুনিস্টদের নিয়ে গঠিত হয় *কার্টুন দল* । কার্টুনকে প্রান্তিকতার জায়গা থেকে সরিয়ে শিল্পের মূল ধারায় ফেরত নিয়ে আসার ক্ষেত্রে *কার্টুন দল*-এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। ২০১৪ ও ২০১৫ সালের সরকারী চারুকলা মেলায় *কার্টুনদল*-এর অংশগ্রহণ ও ২০১৪ সালে মায়া আর্ট স্পেস গ্যালারীতে কার্টুন প্রদর্শনী এই প্রচেষ্টারই অঙ্গ। *কার্টুন দল* আমার কাছে বেশ বড় জোরের জায়গা। কার্টুনিস্টদের একটা প্ল্যাটফর্ম করে দেওয়াটা তাদের অন্যতম উদ্দেশ্য।

এছাড়া উল্লেখ করব *রঙ্গ ব্যাঙ্গ রসিকেষু* তথা *মাসকাবারি* পত্রিকার বর্তমান সম্পাদক প্রদীপ পারেখ-এর কথা। কৃতী বিজ্ঞানী প্রদীপদা জন্মসূত্রে বাঙালি না হলেও বাংলা ভাষা, গান ও সাহিত্য-সংস্কৃতির সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত হয়ে গেছেন। চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত *কিঞ্জল* পত্রিকার বিষয় নির্বাচনে রয়েছে অভিনবত্ব। *গণসংযোগ সংখ্যা*, *বাজি সংখ্যা*, *মোবাইল ফোন সংখ্যা*, *মধ্যবিত্ত সংখ্যা* ছাড়াও শৈল চক্রবর্তী, চণ্ডী লাহিড়ী, অমল চক্রবর্তী, নারায়ণ দেবনাথ ও সম্প্রতি দেবাশীষ দেবকে নিয়ে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছে *কিঞ্জল* । আমার কার্টুন প্রকাশিত হয়েছে *লিপিনাগরিক*, *শনিবারের চিঠি*, *যারা পরিযায়ী* পত্রিকায়। ঐতিহ্যবাহী *সন্দেশ* পত্রিকায় বেরিয়েছে একপাতার কমিক্স। পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত শুভেন্দু দাশগুপ্তের ব্যঙ্গরচনা *সরকার বাহাদুর*-এর প্রচ্ছদ ও ইলাস্ট্রেশন করেছি

আমি। এছাড়া ছড়ার বই *মীরজাফরী চার নম্বরী*-র প্রচ্ছদটিও আমার করা। যখনই ছবি আঁকার সুযোগ পেয়েছি, সাধ্যমতো ভাল কাজ করার চেষ্টা করেছি।

কর্মসূত্রে খিদিরপুর অঞ্চলে যাতায়াত করতে করতে বেশ অনেকদিন হয়ে গেল। ধর্মীয় কারণে কোনরকম গানবাজনাচর্চা ও চবি আঁকায় নিষেধাজ্ঞা ব্যাপারটা আমাকে প্রথমে বেশ হতভম্ব করে দিয়েছিল। একটা বিশেষ সমাজে সেন্স ও হিউমারের অভাব এতটাই প্রকট যে তাঁদের সংবেদনশীলতাকে আহত না করার জন্য বেশ সংযতভাবে কথা বলতে হয়। বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় নাম দিয়ে ফেলে পরে ধর্মীয় কারণে বাড়ির আপত্তিতে সজল চোখে ছাত্রদের নাম তুলে নেওয়া – সামনে থেকে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত যে এমন জিনিসও হতে পারে।

আমি আদ্যোপান্ত কলকাতার ছেলে। কলকাতায় দীর্ঘদিন বসবাসের ফলে বাঙালিদের সাধারণ চরিত্রের বেশ কয়েকটি মজার দিক বেশ অন্যভাবে চোখে ধরা দেয়। একটা উদাহরণ দিই : একসময় মর্নিং ওয়াক করার চেষ্টা করেছিলাম। খুব ভোরে বাড়ির কাছের মাঠে যে দৃশ্যটা চোখে পড়েছিল তা হল বহু বাঙালি ভদ্রলোক পুরোদস্তুর মর্নিং ওয়াকের পোশাকে সজ্জিত হয়ে অর্থাৎ দৌড়নোর জুতো, ট্র্যাকসুট বা দৌড়নোর প্যান্ট পরে রাস্তার একটা চায়ের দোকানে জটলা করছে ধূমায়িত চায়ের কাপ হাতে। হাঁটা বা দৌড়নোর পরিবর্তে তারা রাজনীতির তর্কবিতর্ক করছে – রাজা উজির মারছে! অথচ একই মাঠে অবাঙালিরাও প্রাতভ্রমণে বেরিয়েছেন। তাদের কেউ ফ্রি-হ্যান্ড ব্যায়াম করছেন, কেউ বা জগিং করছেন, কেউ মাঠটা কয়েক-পাক ঘুরে নিচ্ছেন। তাদের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে, ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। এই টুকরো টুকরো দৃশ্যগুলি অনেক কথা বলে দেয়।

আমার ঘুরে বেড়াতে ভাল লাগে মিউজিয়ামে, চিড়িয়াখানায়, বইমেলায়, শপিং মলের বইয়ের দোকানে, আর্ট গ্যালারিতে। চিড়িয়াখানায় ও মিউজিয়ামে বহু অল্পবয়সী শিল্পীকে দেখি মগ্ন হয়ে ছবি আঁকছে। কোনো পাথরের মূর্তি বা জীবন্ত পশু তাদের মডেল। ধীরে ধীরে কাগজে ফুটে উঠছে নিখুঁত অবয়ব। চোখের সামনে একটি ছবির জন্ম হয়। থিমপুজো আমার আকর্ষনের অন্যতম বিষয়বস্তু। এটা মনে হয় পৃথিবীর সবচেয়ে বৈচিত্র্যময়, এক্সপেরিমেন্টাল ও জনপ্রিয় ইনস্টলেশন আর্ট। থিম আর্টিস্টের কল্পনা ও পরিকল্পনার ফসল ওই অপূর্ব মণ্ডপসজ্জা, প্রতিমা, আলোর ব্যবহার ও সমগ্র অ্যাম্বিয়েন্স। বহু শিল্পীকে নিজস্ব প্রতিভা মেলে ধরার সুযোগ করে দিয়েছে এই থিমপুজো পাশাপাশি আয়ের একটা পথও খুলে গেছে। নান্দনিকতা ও কারিগরির মিশেলে তৈরি হওয়া থিমপুজোর বাড়বাড়ন্ত –

মিডিয়ার উচ্ছ্বাস ও মানুষের হুল্লোড় মন্দ লাগে না। মাঝে মাঝে ভাবি এই থিম আর্টিস্টদের দলে ভিড়ে যেতে পারলে বেশ হয়।

তবে বিভিন্ন আর্টিস্ট বিশেষ করে কার্টুনিস্ট, শিল্পমনস্ক ও কার্টুনপ্রেমী মানুষদের সান্নিধ্য পেয়ে চলেছি এ যাবৎ। চর্চা ও ফোকাসের অভাবে প্রকৃত শিল্পী হতে না পারলেও রং ও তুলির জগতের বাসিন্দা হবার ইচ্ছে কিছুটা হলেও পূরণ হয়েছে। কিছুটা হলেও নিজের মনের মতো একটা জগৎ খুঁজে নিতে পেরেছি। জীবনের সমস্ত চাওয়া-পাওয়ার বাইরে এ এক অন্যরকম উপলব্ধি।